International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-IV, July 2021, Page No. 16-27
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i4.2021.16-27

ইতিহাস ও সময়ের চালচিত্রে কবি ননী ভৌমিক

সঞ্জয়কুমার দাস
পি.এইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারতবর্ষ

Abstract

Although it appears in the latter part of the second decade of the twenty-first century, it is safe to say that not even one percent of the books that have been fortunate enough to have numerical enormity have a pen and ink to discuss Nani Bhowmik (1921-1996). But actually he is a prominent writer. And the literature in which part Nani Bhowmik's presence has attracted the reader's attention is definitely fiction. But the reader should know that Nani Bhowmik's poetic talent is no less in poetry. Although he did not go far in the poetic-sea, but in his best novel, has cast a poetic shadow over 'Dhulomati'. His two poems published in 'Natun Sahitya' and 'Aroni' magazines easily captivate the minds of the dilettante. Honestly, if separates history from Nani Bhowmik, then there will be no difference between of camphor and him.

In this discussion, I want to establish the poet Nani Bhowmik with the information and proof in the whole of my erudition.

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের অন্তিম পর্বে উপস্থিত হয়েও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশালতায় যে সকল সমালোচনাত্মক পুস্তক মুদ্রণসৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছে তার এক শতাংশ পুস্তকেও ননী ভৌমিক নিয়ে আলোচনার জন্য হয়নি কালি কলমের সংকুলান। যে সকল গ্রন্থে ননী ভৌমিকের উপস্থিতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সে সাহিত্য প্রকরণটি আবশ্যিকভাবেই কথাসাহিত্য। এতদ্বসত্ত্বেও বলা যায়, ননী ভৌমিকের কবি-প্রতিভা কোন অংশে কম নয়। যদিও তিনি কাব্যিক সমুদ্রে খুব বেশি দূর এগিয়ে যাননি তথাপি ননী ভৌমিক সৃষ্ট কথাসাহিত্যে কবিত্বের ছাপ রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট একমাত্র উপন্যাস ‘ধুলোমাটি’তেও ছায়া ফেলেছে মহাকাব্যিক মাধুর্য। তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্প গুলিতেও ধরা পড়েছে কবিত্বের স্ফুরণ।

কৈশোরে, যখন তিনি বিদ্যায়তনিক সীমারেখায় পৃষ্ঠদেশে বহন করে চলেছেন পুস্তকের ভার তখনই লেখনিশক্তি ভর করে তাঁর মসিতে। একদা কবিগুরু লিখেছিলেন, ‘আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম...’[১] শিক্ষার ভারবাহী শিশু ননীগোপাল ভৌমিক, শিক্ষাকে বহন করার প্রক্রিয়ায় সফল। পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর শৈশবের ঋদ্ধি। যে ঋদ্ধিতায় কবিতার জন্ম। সম্পাদকমন্ডলী কবি এবং কবিতা- পারিবারিক গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। সম্পাদক কবি ননী ভৌমিক। ননী

ভৌমিক চর্চাকারী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেন, সাহিত্যিক ননী ভৌমিকের হাতে খড়ি কবিতাতেই। ননী ভৌমিকের কবিতা রচনার ঘটনায় স্মৃতিতে কড়া নাড়ে 'নষ্টনীড়ে'র অমল-চারুর কাগজ বের করার ঘটনা। যে কাগজের সম্পাদক দুইজন, দুইজন লেখক এবং দুইজন পাঠক । তবে প্রত্যেক দু'জনই এক এবং অভিন্ন। অর্থাৎ তিন দু'গুনে ছয় নয়, তিন দু'গুনে দুই। সে কাগজের অমল প্রস্তাবিত নাম 'চারুপাঠ' হলেও চারু প্রস্তাবিত নাম 'অমলা'। চারুর কথায়, 'আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো- হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারও লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু কপি করে বের হবে ; একটি তোমার জন্য, একটি আমার জন্যে।'[২] ঠিক তেমনই হাতে লেখা পারিবারিক পত্রিকাতে কবি ননী ভৌমিকের আত্মপ্রকাশ । 'অমলা' বা 'চারুপাঠ'এ লেখক-পাঠক-সম্পাদক মাত্র দু'জন । আর ননীবাবু সম্পাদিত পত্রিকার লেখক-পাঠক সংখ্যা অমলদের দেড়গুন অর্থাৎ তিনজন। ননীবাবু নিজে, তাঁর বড়দি প্রতিভা দেবী এবং তাঁদের মা দনুজদলনী দেবী। মনে রাখতে হবে, ননীবাবুর মা দনুজদলনী দেবী উচ্চশিক্ষিতা না হলেও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্য, শরৎসাহিত্য এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই সমকালীন দেশীয় বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর । যে সাহিত্যানুরাগ সমৃদ্ধ করেছে ননীবাবুর শৈশবকে। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'ধুলোমাটি'র মা চরিত্রটি অর্থাৎ মোহিনী দেবীর চরিত্রে আঁকিবুকি কাটে দনুজদলনী দেবীর ছায়া। আর তাঁর বড়দি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানমতে সিউড়ির ভৌমিক পরিবারের মেয়েরা চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে শিক্ষা লাভ করেন, করেন চাকরিও। তবে ননীবাবু সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম কী, তা থেকে গেছে অজ্ঞাতই। পত্রিকাটি সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানেই স্পষ্ট তাঁদের পরিবার বরাবরই প্রগতিশীল।

এরপর যখন তিনি সিউড়ি বেনীমাধব ইনস্টিটিউশনের ছাত্র তখনই তাঁর রচিত কবিতা 'এদিন ও সেদিন' প্রথম প্রকাশের মাহাত্ম্য লাভ করে বিদ্যালয়ের পত্রিকাতে। গৌতম অধিকারী মহাশয়ের কথায় ১৯৩৪ সালে ননীবাবু লিখিত প্রথম কবিতা মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করে বিদ্যালয় পত্রিকায়। কিন্তু বহু চেষ্টা চরিত্র ও যোগাযোগের পরও কবিতাটির উদ্ধারে আমরা ব্যর্থ। 'এদিন ও সেদিন' সংরক্ষণের অভাবে কালের গর্ভে বিলীন। আমরা হতাশ। হতাশার কারণ সময়। বলা ভালো 'অ' সময়। আমরা অসময়ে এ মহৎ কর্মে ব্যাপৃত। ফলে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা। তথাপি হতাশায় নয়, আমাদের অভীপ্সা আলোকের ঝর্ণাধারায় সাধ্য মতো ভেসে থাকা। সে আলোর সন্ধানে শ্রুতিপথে কবি ননী ভৌমিকের কাব্যিক স্বর তান তোলে। এ সময়ে সিউড়ির পাঠ সম্পন্ন করে ননীবাবু উচ্চশিক্ষা গ্রহণে হাজির বর্তমান বাংলাদেশের পাবনায়। পাবনা কলেজে কবিতা তাঁকে পেয়ে বসে। উঠতি বয়সে রোমান্টিক কবিতায় সুবিশাল ব্যপ্তি পালতোলা নৌকার মতো তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। সেই পালের গতি সঞ্চারিত হয় কবি মণীন্দ্র রায়ের বন্ধুত্বে । সেই মনীন্দ্র রায় যার সাথে একদা প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ-এর সম্পাদক নির্বাচিত হবেন তিনি । মণীন্দ্র রায়ের সাহিত্যিক পরিচয় কবিরূপে। কিন্তু ননী ভৌমিকের খ্যাতি কথাসাহিত্যিক হিসেবে । তথাপি শুরুর দিনগুলিতে তাঁর মসি চালনায় কবিত্বের স্ফুরণ ঘটে।

কবি মনীন্দ্র রায় বন্ধুবর ননী ভৌমিককে আধুনিক কবিতার স্বাদ-গন্ধ-প্রকৃতিতে প্রবেশের পথ বাতলে দেন। আধুনিক কবিতার বাঁকবদলের দিনগুলিতে কবিতার প্রকাশভঙ্গি ননী বাবুকে আকৃষ্ট করে । নিবারণ চক্রবর্তীর কথানুসারে এ সময়ের কবিতা রচনায় ননীবাবুর ওপর প্রভাব বিস্তৃত করে বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা । তারপর রংপুর কারমাইকেল কলেজে পাঠকালে সরাসরি ছাত্র রাজনীতি

তথা বামপন্থী রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে তাঁর মনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় । স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সৃষ্টিতে ছায়া ফেলে সাম্যবাদ। এ সময় তিনি কলেজ পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন । 'তাঁর উৎসাহী সম্পাদনায় কলেজ পত্রিকায় সমানে ছাত্র ফেডারেশন ও কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার চলতে লাগল । আর তখন পত্রিকার অনেক রচনার রচয়িতাই ননীবাবু নিজে।'[৩] কিন্তু দুঃখের কথা এসবই অসংরক্ষিত, অনাবিষ্কৃত। ফলে তা অগ্রন্থিতই থেকে গেছে। আর অগ্রন্থনের ফলে পাঠে বঞ্চনা । এসময়ের ননীবাবু রচিত কবিতা বা অন্যান্য রচনা গুলি পাঠে তাঁকে চেনা সহজ হতো। তাছাড়া ইতিহাসের প্রয়োজনেই সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু রচনা রচনাবলীতে স্থান পায় যোগ্য সম্পাদকমণ্ডলীর পাণ্ডিত্যে। উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক সূত্র বজায় রাখা। কিন্তু ননী ভৌমিকের রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সূত্র বজায় রাখা অসম্ভবপ্রায়। কেননা তা দুষ্প্রাপ্য বললেও কম বলা। একেবারে নিশ্চিহ্ন । সে তো ছাত্র-কবি ননী ভৌমিকের কাল। যখন বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সে সময়ে ননীবাবু রচিত অনেক রচনায়ই আজ দুষ্প্রাপ্য।

সময়টা ১৯৪০ সাল। রংপুর কারমাইকেল কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ করে স্নাতকোত্তর হতে প্রত্যাবর্তন এ বাংলায়। কলকাতায়। রাজনৈতিক সম্পৃক্তি ক্রমশই বর্ধিষ্ণু। সেই সঙ্গে সমানে কবিতা লেখা । পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে সাময়িকভাবে চাকরিতে প্রবেশ, অবসরে চটকল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্ব এবং কবিতা রচনা – এ রুটিন ননী ভৌমিকের সময় যাপনের সহায় । এপর্বেই বন্ধুবর গিরিশঙ্কর দাশের মরফতে ননীবাবুর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় বাংলার অন্যতম প্রথিতযশা কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের । ননীবাবু কবিতা লিখছেন আর প্রেরণ করেছেন 'কবিতা' পত্রিকায়, প্রেরণ করেছেন 'নিরক্ত' পত্রিকায় । বেশিরভাগই ফিরে আসছে অমনোনীত হয়ে । সম্পাদকমণ্ডলীর গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও সাহিত্য প্রতিভার অনুসন্ধিৎসু অপারদর্শিতার দিকে আঙুল তুলে বিক্ষুব্ধ হচ্ছেন । 'কবিতা-র কুড়ি বছর' প্রবন্ধে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'আজ ভেবে দেখলে মনে হয় 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা-রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা রূপে । অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা-এমনকি কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিল না ; সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংগত করতে চেয়েছিলাম ।'[৪] অবশ্য ননীবাবুর এ বিক্ষুব্ধতা অনভিজ্ঞতারই নামান্তর । কেননা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে থাকে । প্রথম জীবনে লেখা অমনোনীত হয়নি এমন দৃষ্টান্তই বিরল । 'অযান্ত্রিক' বা 'অতসীমামী' ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত । এসময়েই বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাথে যৌথভাবে 'লিপিসদন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই 'লিপিসদন' থেকে প্রকাশিত হয় 'শেষট্রেন' নামক কবিতা সংকলন । যৌথ সম্পাদক ননী ভৌমিক ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় । কিন্তু 'শেষট্রেন' কাব্যপুস্তিকা নিয়ে বিভ্রান্তি অনন্ত । কেননা গৌতম অধিকারী মহাশয় লিখেছেন, '১৯৪৩ সালে কলকাতায় আসার পর প্রকাশিত হয় বন্ধুদের সঙ্গে একটি কবিতা সংকলন 'শেষট্রেন' ও গল্প সংকলন 'ইশারা' । কবিতা সংকলনে ছিল জগৎ দাশ, গিরিশঙ্কর দাশ, সন্তোষ ঘোষ ও ননী ভৌমিকের কবিতা ।'[৫] কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায় সদ্য প্রয়াত কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছিলেন, 'পরে ওই বাড়িতেই খুঁজে খুঁজে আমি 'শেষট্রেন' বলে এক আধুনিক কবিতার সংখ্যা খুঁজে পেয়েছিলাম । সেটার সম্পাদক ছিলেন ননী ভৌমিক আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । '৪৫-৪৬ সালে বেরিয়েছিল বইটা । জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন সব কবিদের লেখা ছিল তাতে ।'[৬] প্রণববাবুর কথায় এই মর্ম প্রকাশিতব্য যে 'শেষট্রেন' -এর যুগ্ম-সম্পাদক ননী ভৌমিক এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় । সে সংকলনে প্রণববাবু উল্লিখিত কবি প্রমুখ ব্যতীত সম্পাদকদ্বয়ের নিজের কোনো কবিতা ছিল

কিনা, তা সংশয়াপন্ন । কিন্তু গৌতমবাবুর কথায় স্পষ্ট, সে সংকলনে ননীবাবু, গিরিশঙ্করবাবু, সন্তোষবাবু এবং জগৎ দাশের কবিতা ছিল । অবশ্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সে সংকলন সংগ্রহের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে প্রণববাবুর কথায় স্পষ্ট তিনি নিজে সে সংকলনটি নেড়ে-চেড়ে দেখেছেন । নীরেন্দ্র-স্মৃতিতে প্রণববাবুর নিবন্ধ পাঠের পরেই আমরা তাঁর সাথে যোগাযোগ করি । সদর্থক কথাও হয় । কিন্তু করোনা নামক বৈশ্বিক মহামারী আমাদের সব আশায় ঢেলে দেয় জল । ২২ মে ২০২০, তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আমাদের 'শেষট্রেন' প্রাপ্তির প্রত্যাশাও সেইসঙ্গে বিশ বাঁও জলে । কেননা 'শেষট্রেন' প্রাপ্তির প্রত্যাশ জেগে ছিল তাঁর কথায়, 'চেষ্টা করব । তবে দিন কুড়ি-একুশ পরে । শারীরিক অসুবিধা একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ, সেই সংকলনটি পুনরুদ্ধার করা । প্রায় দশ মাস পরে । টাটকা টাটকা বললে, হাতের নাগাল থেকে দেখানো যেত ।'[৭] ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ আবার তাঁর সাথে যোগাযোগ করি । তিনি জানান, 'হয়েছিল । কিন্তু আরেকজন দাদা নিয়ে গেছেন । অনতিবিলম্বে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম ।'[৮] এরপর মার্চ থেকে লকডাউন এবং লকডাউন এর মাঝেই তাঁর প্রয়াণ । বড়ই অসময় আমাদের জন্য । অপূরণীয় ক্ষতি ।

ননীবাবুর কবিতা আলোচনায় প্রবেশ করে একথা ভুললে চলবেনা যে, অমরকাব্য সৃষ্টির নেশায় তাঁর মসিচালনা নয় । তিনি নিজেই স্বকালের ফসল । তাঁর সৃষ্টিও সময়ের সাক্ষ্য বহন কারী এক একটি মাইলস্টোন । তাই তাঁর কবিতাগুলির চিরায়ত সাহিত্য মূল্য নির্ধারণ আমাদের উপজীব্য নয় উপজীব্য তার ঐতিহাসিক মূল্য । আপাতত মাত্র দু'টি কবিতা আমাদের হস্তগত হয়েছে । তাও 'কথারূপ' পত্রিকার সৌজন্যে । প্রথমটি 'অরণি' পত্রিকায় দ্বিতীয়টি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত । যথাক্রমে ১৯৪২ ও ১৯৫২-৫৩ সালে । দুটি কবিতার প্রকাশের ব্যবধান প্রায় দশবছর । তাই আমাদের অনুমান এর বাইরেও ননীবাবুর কবিতা কিছু থেকে থাকতে পারে । কিন্তু তা আজও আবিষ্কৃত হয়নি । এ বিষয়ে গল্পসরণি সম্পাদক অমর দে মহাশয় ভীষণরকম প্রত্যয়ী । প্রত্যয়ী গৌতম অধিকারী মহাশয়ও । গবেষণা চলাকালীন সময়ে সে বিষয়ে সন্ধান পেলে তা এই আলোচনায় দেব গেঁথে । এখন প্রাপ্তির কথা । প্রথম কবিতাটির নাম 'গরিলা' । যদিও গৌতমবাবু কবিতাটির নাম 'গেরিলা' হওয়ার পক্ষে মত দান করেন । কবিতাটি 'অরণি' পত্রিকায় ২৯.০৫.১৯৪২ সালে প্রকাশিত।

কবিতাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইতিহাসের পদধ্বনি শুনি। যে সময়ে আজ ইতিহাসে পর্যবসিত । যে ইতিহাসকে বাদ দিলে ননী ভৌমিকের ব্যক্তি ও সাহিত্যিক সত্ত্বা অস্তিত্বহীন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ননী ভৌমিকই স্বকাল ও ইতিহাসের ফসল। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিকজীবন পরিচালিত হয়েছে সমসময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। বর্তমান কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কবিতাটির রচনা ও প্রকাশকালের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে, সে সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যায়তনিক পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে মনোনিবেশ করেন পার্টির কাজে সর্বক্ষণিক কর্মী রূপে। সেইসঙ্গে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রতিবেদক। পত্রিকা এবং দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঘুরেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দেখেছেন তাদের জীবন যাপনের মাপকাঠি। তবে সে দেখায় রয়েছে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যে সাম্যবাদের মূল নিহিত মার্কসবাদে। আজ বিশ্ব মানচিত্রে পুঁজিবাদের আধিপত্য। সাম্যবাদের মূল শত্রু পুঁজিবাদ। সাম্যবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী। আবার ননী ভৌমিক সাম্যবাদী। মুখ্যত এই দর্শনই কবিতাটিতে বাঙ্ময় রূপলাভ করেছে।

ফসলের মালিক কৃষক। কৃষকের স্বার্থ রক্ষা মার্কসবাদের মস্তিষ্কপ্রসূত। অক্ষয়কুমার দত্তের 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণনা' একটি দর্পণ। যে দর্পণে সমগ্র প্রজাসাধারণের দুর্দশা প্রতিফলিত। লর্ড কর্নওয়ালিস

প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থক, নির্দিষ্ট আয় সুনির্দিষ্ট হলেও ভারতবর্ষের কৃষক ও কৃষি উন্নয়ন সাধিত হয়নি। কোম্পানি প্রবর্তিত 'দশশালা বন্দোবস্ত'র অন্তর্গত 'সূর্যাস্ত আইন'-এর ফলে বহু প্রকৃত জমিদার তাঁদের জমিদারিত্ব হারান। জমিদারির শূন্য স্থান পূরণে এগিয়ে আসেন ধনী বনিক শ্রেণি। যাদের সাথে কৃষক তথা প্রজাসাধারণের ছিল না কোন যোগ । ফলে জমিদারি পদ্ধতিটিকে তাঁরা ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন । যে কোনো উপায়ে অধিক মুনাফা তাঁদের মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ। ফলে বাড়তে থাকে প্রজাসাধারণের দুর্গতি । মহাজনী প্রথার মরণফাঁদে আটকে সর্বস্বান্ত হতে থাকে কৃষক সাধারণ। 'In 1842 Sir Thomas Munro, as Census Commissioner, reported that there were no landless peasants in India (an undoubtedly incorrect picture, but indicating that the numbers were not considered to require statistical measures). In 1882 the senses estimated 7.1/2 million ''landless day labours'' in agriculture. The 1921 census returned a total of 21 million, or one-fifth of those engaged in agriculture.'[৯] অর্থাৎ জনগণনা কমিশনার স্যার টমাস মুনরো প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৪২ সালে একজনও ভূমিহীন কৃষক ছিল না । কিংবা হয়তো ছিল, কিন্তু এতই নগণ্য যে তা পরিসংখ্যানাতীত । অথচ ১৮৮২ সালে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা আনুমানিক ৭৫ লক্ষ এবং ১৯২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ১০ লক্ষে । যা তৎকালীন ভারতবর্ষের কৃষি কাজে নিযুক্ত মানুষের এক-পঞ্চমাংশ । তাই স্বভাবতই ঐতিহাসিক হোমস এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বলেছেন, 'The permanent settlement was a sad blunder'[১০]. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চির অন্ধকারে নিমজ্জনের হাত থেকে কৃষক শ্রেণির রক্ষার তাগিদ অনুভব করেন অনেকে। সে অনুভবের তাগাদায় ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেস পার্টির তত্ত্বাবধানে 'নিখিল ভারত কৃষক সভা' গঠিত হয় এবং তদানুসারে ওই বছরের আগস্ট মাসে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক'সভা'র পথ চলা। অবশ্য জমিদারি প্রতিনিধিদের অধিকাংশই কংগ্রেস ঘেঁষা হওয়ার ফলে বঙ্গীয় কৃষকসভার রাশ হাতে পায়ে কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে জমিদারি প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদে উঠে পড়ে লাগে বামপন্থীরা। ১৯৩৯-৪০ সাল নাগাদ উত্তরবঙ্গে আধিয়ার আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। ইতিপূর্বেই ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন করে। ১৯৪০ সালে সে কমিশন রিপোর্ট জমা করে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের কোনও প্রয়াসই লক্ষ্য করা যায়নি। মূলত বাংলায় তেভাগা কৃষক আন্দোলনের মূল সুর নিহিত ছিল 'ফ্লাউড কমিশনে'র রিপোর্টেই। 'ফ্লাউড কমিশন' তেভাগার সুপারিশ করে । ১৯৪০ সালেই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র অধিবেশনে তেভাগা বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় । ফলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝেই কৃষক সভাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি। ১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে এদেশীয় কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামের পক্ষে মত দেন। কিন্তু তথাকথিত বৃহত্তর দলীয় শক্তি হিসেবে কংগ্রেস তাতে রাজি নয় । ফলে তৈরি হয় সংঘাতের আবহ। নেমে আসে বামপন্থার প্রতি আঘাত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভাও সেই কোপদৃষ্টির শিকার। রাহুল সাংকৃত্যায়নসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন । অনেককেই আশ্রয় নিতে হয় আত্মগোপনের আড়ালে। বাঁচতে হয় শত্রুর নজরবন্দি থেকে, চিনে নিতে হয় জাত শত্রুদের। কবিতাটির প্রথম চার পঙক্তিতে উক্ত ইতিহাসেরই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত । আবার, 'মৃতদেহ আর হাহাকার চিনে চিনে / আজ অভিজ্ঞ ; রাইফেল লটকাই –'/টুকরো সালের সংকেতে অম্লান' - পংক্তিত্রয়ে উল্লেখিত মারণাস্ত্রই মৃত্যুর আজ্ঞাবাহী । কিন্তু কেন ? কেন, সে মারণাস্ত্র উঠে এলো হাতে ? কিংবা কাদের ? ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় । 'গরিলা' শুধু একটি কবিতা নয়, একটি শোকাবহ ইতিহাস । যে ইতিহাসের অঙ্গী কবি স্বয়ং । আমরা সকলেই জানি, ব্রিটিশ ভারত শুধু নয়, স্বাধীন ভারতেও বামপন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । প্রথমে ১৯৩৪

সালের ২৩ জুলাই এবং পরে ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ। কিন্তু বারবার নিষিদ্ধকরণের কারণ কী ? সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন । বিশেষত ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন কেন্দ্রিক বৈপ্লবিক চেতনার বশবর্তী হয়ে ত্রিশের দশকে বহু বিপ্লবীদল ভারতের মুক্তিতে বেছে নেয় আপাত কথিত সন্ত্রাসবাদের পথ। ১৯০৪-১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘনীভূত হয়। 'অনুশীলন সমিতি', 'গদর পার্টি', 'যুগান্তর দল' প্রভৃতি সংগঠন একসময় বামপন্থী ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেয়। কারাবাসী বিপ্লবীদের জন্য কারাগারই হয়ে ওঠে মার্কসবাদের আদর্শ পাঠশালা। তিরিশের দশকেই বামপন্থার শক্তিবৃদ্ধি । নানা শাসক বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্বে কমিউনিস্ট পার্টির দলীয় প্রতীক হিসেবেও মর্যাদা পায় কৃষকের হাতিয়ার 'কাস্তে'।

ননী ভৌমিক সমসাময়িক কবি দীনেশ দাশও একদা ডাক দিয়েছিলেন, হাতিয়ার তৈরি রাখার 'কাস্তে' কবিতায়- 'বেয়নেট হ'ক যত ধারালো / কাস্তেটা ধার দিয়ে বন্ধু, / শেল আর বোম হ'ক ভারালো / কাস্তেটা শান দিও বন্ধু ।' [১১] চিরাচরিতভাবেই কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির হাহাকার ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী সমাজের কর্ণকুহরকে স্পর্শ করেনি । আর তা করেনি বলেই অনাহার-অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুমরে মরতে হয়েছে তাদের । মরতে হয়েছে শাসকের অস্ত্র ও আইনি কুচক্রীতায় । ননী ভৌমিক এ ইতিহাস জানেন । জানেন বলেই আজ তিনি অভিজ্ঞ । যে হাহাকার চিনে চিনে ননীবাবু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেই হাহাকার শুনে শুনে পদাতিক কবি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হওয়ার আহ্বান জানান- 'শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না / প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা ; / মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না - / পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা ।' [১২] আবার ফসলের ডাকে কিশোরকবি সুকান্ত ভট্টাচার্যও চেয়ে নেন - 'কাস্তে দাও আমার হাতে / সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেবো তাতে ।' [১৩] -এই অভিজ্ঞতায় ভর করেই হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন কবি আত্মরক্ষার্থে । এ 'আত্ম' 'একা আমি' নয় - এ 'আত্ম' পর্যবসিত 'আমরা'য় । 'আমরা' অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের হিতাকাঙ্খী শ্রেণি এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই দেশব্রতী মানুষ । দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার অপরাধে ক্ষুদিরামের শহীদ হওয়ার সাক্ষ্য ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে । চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ দেশমাতৃকার কল্যাণে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন । বেছে নিয়েছেন চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের পথ । কেননা নরমপন্থীদের কাকুতি-মিনতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রবাহকে গতি দানে ব্যর্থ বলেই তাঁদের অভিমত । ভারতবর্ষকে মহান ও মুক্তদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যই চরমপন্থার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ । যদিও তিনি চরমপন্থাকে নেতিবাচক অর্থে নয়, গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন । তথাকথিত লাল-বাল-পাল গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবোধের আগ্রাসী মনোভাবকে সমর্থন করেন । তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবী সৈনিকরা হাতে তুলে নেন অস্ত্র । ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতাত্মার কাঙ্খিত মুক্তিতে শহীদদের আত্মায় শান্তি বর্ষিত হয় ।

'সূর্য প্রণাম এখানেই রেখে যাই, / পাহাড়িয়া পথ ঢালু আর উৎরাই / শোনে, স্পন্দিত অমাবশ্যার গান !' -পার্থিব সকল শক্তির আধার সূর্য । সূর্যের আবির্ভাব-তিরোভাবেই দিনরাত্রি । সূর্য প্রণাম প্রভাতী সংস্কার । প্রভাত দিনের সূচনা লগ্ন । তথাপি চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যাওয়ার আহ্বান, আহ্বান অমাবশ্যার গান শোনার । প্রকৃতঅর্থে আলোক সন্ধানী কবি অমাবশ্যার বন্ধুর পথ পেরোনোর সৈনিক । রবীন্দ্র-পরবর্তী সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি / তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে / আমরা কি তিমিরবিলাসী ? / আমরা তো তিমিরবিনাশী / হতে চাই / আমরা তো তিমিরবিনাশী।' [১৪] আলোর

প্রত্যাশাতেই অন্ধকার যাপন। যাপিত অন্ধকারের কণ্টকাকীর্ণ পথেই আসবে আগামীর বার্তা। যারা এই পথের সৈনিক তাঁদের জন্য কবি নজরুলের সাবধান বাণী 'দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার / লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।' [১৫]

পরাধীন ভারতবর্ষের হাহাকারই অমাবশ্যার গান। যে গানের স্পন্দন দেশব্রতী সৈনিকদের কর্ণকুহরকে সজাগ রাখে। প্রত্যয়ী করে তোলে। মধ্যযুগীয় স্বর-বিনির্মাণের রুপরেখায় বাংলা সাহিত্য পাঠক উপহার পেয়েছিলেন 'অমাবশ্যার গান' শিরোনামাঙ্কিত উপন্যাস। ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মধ্যযুগের অন্যতম কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কথনবিশ্ব কায়িকরূপ লাভ করেছে। 'অন্নদামঙ্গল' গান অন্ধকারের ভ্রুকুটি অতিক্রম করে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। মনে রাখতে হবে, এই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই ননী ভৌমিকের সাহিত্য প্রসূত ভাষাকে 'খাপ খোলা তরবারি'-র সাথে তুলনা করেছিলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করাই প্রকৃত আলোক সন্ধান। যার শপথবাণী রূপ লাভ করেছে কবিতায়। কবিতাটির নাম 'গরিলা'। কিন্তু তা 'গেরিলা'ও হতে পারে। এমন সম্ভাবনা ইতিপূর্বেই উল্লেখিত। 'গেরিলা' বলতে আমরা বুঝি এমন ছোট ছোট দল, যে দল অধিক সংখ্যক সেনা বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তোলে চোরাগোপ্তা হামলায়। যে চোরাগোপ্তা হামলা বা গেরিলা বাহিনীর সাহায্যে আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের অবসান ঘটান নেলসন ম্যান্ডেলা মহাশয়। কবিতাটির ছত্রে ছত্রে গেরিলা বাহিনীর রূপই প্রকটিত। কবি নিজেই যেন সেনাবাহিনীর এক নিষ্ঠাবান সৈনিক। আবার 'গরিলা' নামকরণের ব্যঞ্জনায় উপলব্ধিত আফ্রিকার বিশাল আকার বানরস্থানীয় শক্তিশালী প্রাণীর কথা । কিন্তু তার সাথে কবিতা ভাবনার বৈসাদৃশ্যই বর্তমান । তাই আমাদের সমর্থন 'গেরিলা'র পক্ষেই। তবে শুধুমাত্র ননী ভৌমিকের কবিতাতেই নয়, গেরিলাদের কথা উঠে এসেছে সমসাময়িক আরে'ক সাম্যবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কলমেও। তিনিও প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন একজন গেরিলা সৈনিক হয়ে ওঠার- 'আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক! / লুপ্ত অধুনা এদেশে তোমার গুপ্ত ঘাতক / হাজার জীবন বিকশিত এক রক্ত-ফুলে, / পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে ।' [১৬]

আবার ননী ভৌমিকের দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'একটি রাত্রি'। কবিতাটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত । ইংরেজি ১৯৫২-৫৩ সালে। 'একটি রাত্রি' কবিতাটিতে বাঙ্ময় রূপলাভ করেছে ননী ভৌমিকের স্মৃতি । কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সৃজনের সাথে ননীবাবুর সৃষ্ট সাহিত্যের সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য । কাজী নজরুল তাঁর যাপিত জীবন ও সৃষ্ট সাহিত্যের অভিমুখে ধেয়ে আসা প্রশ্নের জবাবদিহি করতে গিয়ে লিখেছেন- 'বড় কথা বড় ভাব আসে নাক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে ! / অমরকাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে !' [১৭] 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে বিদ্রোহী কবির আর্তি- 'প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, / যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ ।[১৮]

ইতিমধ্যেই পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে স্বাধীনতার স্বাদ-গন্ধে মাতোয়ারা ভারতীয়রা । অথচ সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও কেন ননীবাবুরা অমরকাব্য সৃষ্টির নেশায় মেতে ওঠেননি। তাঁরা কি তখনও সুখের সন্ধান পাননি? ঠিক তাই। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে কৃষক-শ্রমিক সাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তাই বামপন্থী আদর্শে আদর্শায়িত ননীবাবুদের নিকট প্রাপ্ত স্বাধীনতার মিথ্যার নামান্তর। কমিউনিস্ট দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ কলকাতায়। এই অধিবেশন থেকে 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' শ্লোগান জোরালো হয় এবং ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বামপন্থি সক্রিয় ক্রিয়াকর্মে সরাসরি যুক্ত থাকার অপরাধে ১৯৪৮ সালেই তিনি গ্রেপ্তার হন। পরে ১৯৫০ সালের ৩ জানুয়ারি আবার গ্রেপ্তার হন। কালের সরণি বেয়ে লালবাজার প্রেসিডেন্সি হয়ে কারাজীবনের চূড়ান্ত পর্বে স্থানান্তরিত হন ব্রিটিশ ভারতের দ্বিতীয় ভয়ংকরতম বন্দিনিবাস বক্সায়। 'হেবিয়াস কর্পাস' কিংবা ভারত সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিপাক্ষিক আপস-মীমাংসায় কারা মুক্তি ঘটে বিনা বিচারাধীন বন্দি ননী ভৌমিকের। কারাবাসের স্মৃতি রোমন্থনে স্বপ্নের ভাঙ্গা-গড়া কবিতায় প্রাণবন্ত। প্রথম কবিতাটি দশ চরণান্তিক আণবিক বোমা। যা পাঠকের চিত্তে হরদম বিস্ফোরিত। আর দ্বিতীয় কবিতাটি ভারতাত্মার মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লবী সৈনিকের আত্মকথন। তবে এ আত্মকথন সকল বিপ্লবী সৈনিকের আত্মকথনের পর্যায়ে পর্যবসিত।

কবিতাটির প্রথম স্তবকে বক্সা দুর্গ নিবাসের প্রাকৃতিক অবস্থান ও পরিবেশ, দ্বিতীয় স্তবকে কারাগারের নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম, তৃতীয় স্তবকে ব্যক্তিগত অনুভূতি, চতুর্থ স্তবকে আত্মজিজ্ঞাসা, পঞ্চম স্তবকে আত্মরক্ষা বা আত্ম সমর্থন এবং ষষ্ঠ বা শেষ স্তবকে সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরে পারিপার্শ্বিক প্রবণতা প্রকটিত। সমগ্র কবিতাটি পাঠে একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে দৃশ্য বিচারব্যবস্থার। যে দৃশ্যে বিচারালয়-বিচারক-আইনজীবী-বিবাদীপক্ষ-সওয়াল-জবাব প্রভৃতির উপস্থিতি । সবই উপস্থাপিত হয়েছে বিবাদীপক্ষের অন্তর্বয়ানে। বিবাদীপক্ষের অন্তর্বয়ানে প্রকাশিত সওয়াল-জবাব প্রকৃতপক্ষে সমকালীন ইতিহাসেরই প্রতিচ্ছবি। যা সমগ্র ননী ভৌমিক সাহিত্যের মূল সুর। 'একটি রাত্রি'তেও সে সুরেরই কলতান। 'গরিলা' কবিতায় মশালের লালে শপথ নিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী ঘোষণা –'রুখব গায়ের ফসলিয়া মাঠ আর ঘর :' , কিন্তু সেই ফসল রক্ষার শপথ রক্ষা করতে গিয়েই শাস্তির খাঁড়া নেমে এসেছে ললাটে । হতে হয়েছে গ্রেপ্তার। বিনা বিচারে কারাবাস দিনের পর দিন। প্রকাশ পেয়েছে খেদোক্তি – 'ধান ক্ষেত ভালবাসা পাপ?' সমসাময়িক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কলমেও ফসল রক্ষার তাগাদা কবিতায় রূপ নিয়েছে- 'স্বপ্নের বীজ বপন করেছি সদ্য / বিদ্যুৎবেগে ফসল সংঘবদ্ধ / হে সাথী, ফসলে শুনেছ প্রাণের গান ? / দুরন্ত হাওয়া ছড়ায় ঐক্যতান।'[১৯]

মনে রাখতে হবে ধানক্ষেত রক্ষার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কৃষকের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটেছেন ননী ভৌমিক। কবিতাটিতে উঠে এসেছে একটি প্রদেশের নাম। নামটি 'তেলেঙ্গানা'। ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই জানা যায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ভারতবর্ষে তেলেঙ্গানা হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যের অধীন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালে ১০টি জেলা নিয়ে তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্ম। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বারবার বিদ্রোহের আঁচে উত্তাল হয়েছে তেলেঙ্গানা, যা তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ নামে ইতিহাসে উজ্জ্বল। যে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের প্রাণ লুকায়িত কৃষক সাধারণের সম্মিলিত শক্তিতে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কৃষক বিদ্রোহের সূচনা এবং তার আগুন অস্তমিত হয় ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর। আইলাম্মার জমি ও ফসল রক্ষাকে কেন্দ্র করে তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহের সূচনা। তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহের আঁচ উষ্ণতার সঞ্চার করে বাংলাতেও । ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলায় তেভাগার দাবি জোরালো হতে শুরু করে। তেলেঙ্গানা এবং বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই চালকের আসনে কমিউনিস্ট পার্টি। বাংলায় বিশেষত উত্তরবঙ্গে আধিয়াররা যখন তেভাগার দাবিতে অনড় তখন ননী ভৌমিক 'স্বাধীনতা'র সূত্র ধরে পার্টির নির্দেশে সেখানে উপস্থিত হন । মাল থানায় আপস-আলোচনার মাঝে গ্রেপ্তার হন ননী ভৌমিক। তেভাগার হাল-হকিকত প্রতিবেদনের রূপ ধরে 'স্বাধীনতা'র পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। কিংবা সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অন্তর্গত চন্দনপিঁড়ির অহল্যা

দাসী তাঁর প্রতিভাগুণে পরিণত হয় 'অহল্যা মা'-এ 'অহল্যা নৃত্যনাট্যে'র পথ ধরে। এবং বাংলার গলি থেকে রাজপথে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সাহিত্যরূপ ধরে 'ধানকানা'য়। তেভাগা কেন্দ্রিক সাহিত্যের কিংবদন্তী 'ধানকানা' । তাই বাংলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তেলেঙ্গানার চর্চিত অভিজ্ঞতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ননীবাবুর কলমে। 'আর নামে আর্তনাদে ফাঁসির আদেশ-/ থরো থরো তেলেঙ্গানা রাত।' ১৯৪৮-১৯৫০ সাল - এই দুই বছরে তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর কী প্রকার অত্যাচার চালানো হয় ইতিহাস তার সাক্ষী। সরকারী মদতে কংগ্রেস সেবাদল সেখানে গণহত্যায় মেতে ওঠে । শুধু সেবাদলই নয়, 'পুলিশী অ্যাকশন'ও সন্ত্রাস লাঞ্ছিত। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে প্রহসনিক বিচার ব্যবস্থায় বামপন্থী আন্দোলনকে ছত্রখান করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে অবিরত। 'এমনকি ১৫-১৬ বছরের ছেলেদের প্রাণদণ্ড ও দশ বিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হতো । ১৪ বছরের ছেলে দিনা লিঙ্গাইয়াকে ৪৬ বছর কারাদণ্ড হলো। ১৬ বছরের ছেলে ইয়েরাবোটু রাম রেড্ডিকে ১৯৫০ সালে আদালত প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়।'[২০]

নাৎসী কায়দায় বিচার প্রক্রিয়া ও রায়দান জনমানসে তো বটেই সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ বিষয়টিকে দেখতে থাকেন ঘৃণার চোখে। জানাতে থাকেন আপত্তিও। সেইসঙ্গে প্রতিবাদ। ঠিক এই সময়ে তৎকালীন ভারত সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছিল প্রাণদণ্ডাদেশ বাস্তবায়নের, কিন্তু অতি সন্তর্পনে। 'তারা স্থির করেছিল তেলেঙ্গানার ১২ জন বীরকে শমণসদনে পাঠাবে । তারা হলো সেই বিখ্যাত বিখ্যাত ১২ জন, জগৎবিখ্যাত ব্রিটিশ গণতন্ত্রপ্রিয় ব্যারিস্টার ডি. এন. প্রিট নিজে ব্যক্তিগতভাবে তাদের হয়ে মামলায় সওয়াল করেছিলেন এবং তাদের সমর্থন করেছিলেন। ওরা স্থির করেছিল ২২ জানুয়ারি ১৯৫০ এদের পাঁচজনকে ফাঁসি দেবে, আর ২৩ তারিখে দেবে সাতজনকে। মৈসাইয়া ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। জেল কর্তৃপক্ষ ৯ জানুয়ারি তারিখে হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল জেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর নেয় এবং সেগুলোকে সেকেন্দ্রাবাদ জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কথা।'[২১]

তবে ডি.এন. প্রিটের ন্যায় ব্যারিস্টার এই মামলার সাথে জড়িয়ে থাকার কারণে প্রাণদণ্ডাদেশ লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হলেও বাস্তবে দেখা যায় জঙ্গলেপাহাড়ে নিয়ে গিয়ে গুলি করে - হত্যার প্রবণতা। এ প্রসঙ্গে এও স্বীকার্য যে, শাসকের দমন-পীড়ন নীতি যতই আটোসাটো হতে থাকে ততই বাড়তে থাকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিধি। শেষমেষ ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ তেলেঙ্গানা আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। বামপন্থার ধ্বজা যার উচ্চকটিতে সদা উড্ডীয়মান, এহেন ননী ভৌমিকের নিকট এ ইতিহাস অজানা নয়। তাছাড়া তিনি নিজেও তার অঙ্গী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সাদাচোখে দেখা স্বকালের মর্মবিদারী এ দৃশ্য তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে। 'একটি রাত্রি' কবিতার প্রথম দুই স্তবকে বক্সাদুর্গের যে চিত্র উপস্থাপিত, পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বাংলা'র 'মেঘের গায়ে জেলখানা'য় ননীবাবুরই প্রতিধ্বনি শুনি। দু'যুগ আগে ইংরেজরা প্রথম তৈরি করে এই বক্সা দুর্গ। ইংরেজ শাসকরা ভুটান রাজার কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে ইজারা নেয় এ স্থান। এখানে একটি কেল্লা ছিল। সেই পুরনো কেল্লাতেই প্রথম জেলখানা তৈরি হয়। কিন্তু কাদের জন্য জেলখানা? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'নিজের দেশকে যারা ভালবাসে, তাদের আপন প্রিয়জনদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে সেদিন দূর দেশান্তরে বনবাস দেবার ব্যবস্থা করেছিল ইংরেজি সরকার।...
দেশকে ভালবাসা ছাড়া আর কোন অপরাধই যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়নি, আজও তাদের স্থান বক্সায়।'[২২]

তিনটি ফটক পার হয়ে তবেই জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। বাইরের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বেই কয়েদিদের গরাদে ঢোকানো হয় গাণিতিক কায়দায়। কয়েদিরা একটি সংখ্যামাত্র । জঙ্গল ঘেঁষা এই

দুর্গে অন্ধকারের ভ্রুকূটি জানান দিতে থাকে নিঃসঙ্গ জন্তুর ডাক। এখানে শুধু পাথর দেওয়াল আর কাঁটাতার। 'জেলখানাটা পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর ওপর।'[২৩] অর্থাৎ জেলখানা পাথরময় পাহাড়ে। বস্তুত এই দুর্গটি প্রথমে ছিল বাঁশের তৈরি। ইংরেজরা এটিকে পরিণত করে পাথরের দুর্গে। আর কাঁটাতার? বক্সাদুর্গের কাঁটাতার প্রসঙ্গে সুভাষবাবুর উল্লিখন, 'ভেতরে যত কাঁটাতার আছে, সমস্ত এক করলে লম্বায় কয়েক মাইল হবে।'[২৪]

বহু যন্ত্রণা নিয়ে এখানে দিনযাপন করতে হয় কয়েদিদের। কারও যন্ত্রণা ব্যক্তিগত আবার কারও যন্ত্রণা সর্বজনিক। সাধুচরণ, মোস্তফা, খাঁ সাহেবের সেই যন্ত্রণা পাঠকের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে সুভাষবাবুর স্মৃতিরোমন্থনের সূত্র ধরে। 'একটি রাত্রি'তেও সেই যন্ত্রণা ননীবাবুকে বিধ্বস্ত করে তোলে। নেশাতুর সিপাহিদের ডিউটি বদল – প্রাত্যহিক টহলদারি – বেতালা বুটের শব্দ কয়েদিদের অতিপরিচিত। অহর্নিশি সেন্ট্রিবক্সের নজরদারি এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্যি নেই কারও । আলো-বাতাসহীন সেইসব কুঠুরিতে রাত্রিযাপন কতখানি অস্বাস্থ্যকর তা তাঁরাই বোঝেন, যাদের আছে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কাঁটাতার ঘেরা এই কারাগারের আদি বাসিন্দা বলে কেউ নেই। বর্তমান বাসিন্দারা সকলেই কাঁটাতারের ওপারের। যারা একদিন ভারতবর্ষের মুক্তি কামনায় শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জনমানসকে শাসকের জনহিত-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করতে মরণপণ শপথ নিয়েছিলেন তাঁদের অনেককেই বক্সার বন্দি জীবন করতে হয়েছে অতিবাহিত । অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের অনেক বিপ্লবীদের এখানে ত্রিশের দশকে বন্দি রাখা হয়। আর পঞ্চাশের দশকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরীর, পারভেজ শাহেদী, চিন্মোহন সেহানবিশসহ ননী ভৌমিকদের বহু দিবানিশি যাপনের সাক্ষী আছে এই বন্দিনিবাস।

কয়েদিদের স্বপ্ন, আশা ও আশাভঙ্গের বেদনা গুমরে মরে হৃদয়হীন পাথরের অভিঘাতে। প্রবাহকে আবদ্ধ রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় তার সাবলীল প্রবাহমানতা যেমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তেমনি ভয়ঙ্করভাবে কয়েদিদের বিশেষত ননী ভৌমিকের স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের বেদনা হৃদয়ের বন্দরে বন্দরে লহর তোলে । অস্ফুট আক্রোশের ধ্বনিতে মুখরিত স্বর জন্ম দেয় এক প্রশ্নের 'ধানক্ষেত ভালবাসা পাপ ?' কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় বামপন্থার অবদান বিস্মরণের কোন পথ নেই। কিন্তু কৃষক স্বার্থ রক্ষা করা কি সত্যিই অপরাধ যোগ্য কর্ম? ননী ভৌমিকের হৃদয়ের অন্তস্থলে এই প্রশ্ন বারবার তান তোলে। শুধু ননী ভৌমিকই নন। সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য ভূমিতে সন্ধান পাওয়া যাবে কৃষক শ্রেণির কথা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উঠে আসবে সেই তালিকায় । চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে কৃষকবন্ধু কমরেডরা ঝাঁপিয়ে পড়েন আত্মবলিদানে । একদা জোতদার, মজুতদারদের মানুষ পদবাচ্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি কিশোর কবি। 'তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার/ মানুষ ছিল কি ? জবাব মেলে না তার ।'[২৫] মজুতদারদের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন- 'শোন রে মজুতদার,/ ফসল ফলানো মাটিতে রোপন / করব তোকে এবার ।'[২৬]

ননীবাবুর মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক প্রশ্ন শাসক শিবিরকে অস্বাভাবিক, অস্থির করে তোলে । বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে শাসক শিবির হিটলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নাৎসী কায়দায় বিচার ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করে। ভুয়ো মামলায় দোষী সাব্যস্তের বহর দেখে নেমে আসে নিন্দার ঝড় । তবু তারা নির্বিকার। তারপর শুরু হয় 'এনকাউন্টার'। এনকাউন্টারের নামে আন্দোলনকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করায় তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল হয় বিপরীত । বরং লাল ঝান্ডার মাহাত্ম্যের আকর্ষণী ক্ষমতায় মেহেনতি মানুষ আঁকড়ে ধরতে থাকে ক্রমশ । উল্টোদিকে রাষ্ট্রীয় নিশান জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় নুইয়ে পড়ে।

লাল ঝাণ্ডাকে রোখা এক রকম অসম্ভবপ্রায়। কিন্তু ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চায় শাসক শিবির '...সেপাইদের হাতে লাঠির বদলে তুলে দিয়েছিল টোটাভরা বন্দুক।' [২৭] আর ননীবাবুর কথায়- 'মুখর জীপের শ্বাসে মিলিটারি তাঁবুতে তাঁবুতে / ব্যবহৃত কার্তুজের অল্প শূন্য খোলে / বায়ূ শিহরায়।' মনের অন্দরমহলে যখন এই অমাবশ্যার গান বাজতে থাকে তখন একজন মার্কসবাদে আদর্শায়িত মানুষের ঘুম যে ধরবে না - সে তো খুবই স্বাভাবিক। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে / বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।' বর্গী-আক্রমনের ভয় দেখিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো সহজ কিন্তু সেই সুরে কি ননী ভৌমিকের মতো মানুষের ঘুম আসে ? আসে না। তাই বক্সায় বহু নিশি জাগরণের সাক্ষ্য থাকতে হয় ননী ভৌমিকদের।

মাত্রদুটি কবিতা দিয়ে কারও কবিত্বের বিচার সম্ভব ? আমরা সেই দুঃসাহস দেখাতে চাইওনি। শুধুমাত্র তাঁর সৃষ্টিকে ইতিহাসের খাপে ফেলে দেখে নিতে চেয়েছি সময়ের দর্পণ হিসেবে তা কতখানি স্বচ্ছ। সবশেষে শুধু এইটুকু বলে রাখা, সহজ-সরল, আটপৌরে ভাষাকে কবিতার অবয়ব রূপে গড়ে তোলার দক্ষতায় ননী ভৌমিকের স্বতন্ত্রতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঠকের । একই শব্দের পুনরাবৃত্তিতে তাঁর স্বতন্ত্রতা বর্তমান। আর বাকভঙ্গিতেও। সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'ননী ভৌমিকের লেখক চরিত্র আসলে রোমান্টিক। তাঁর গদ্যে এই রোমান্টিকতা স্পষ্ট । তাই ননীবাবুর অনেক লেখার ভাষাই কবিতার ভাষাকে মনে পড়িয়ে দেয়।' [২৮] কী 'ধানকানা', কী 'পূর্বক্ষণ', কী 'ধুলোমাটি' কী 'চৈত্রদিন' সর্বত্রই ননী ভৌমিকের কবিত্বের ছাপ রয়েছে । তাঁর সৃষ্টিতে প্রতীতিবাদ ও চেতনাপ্রবাহ রীতির লক্ষ্যণ প্রকটিত।

সবশেষে বলতে হচ্ছে, মাত্র দুটি কবিতার মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিত পেয়েছি, সেই ইঙ্গিতে আমরা উপস্থিত হই ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে। যে ইতিহাস জলছবি এঁকে যায় সময়ের আলপনায়। আর ননী ভৌমিক উদ্ভাসিত হন আলপনার ন্যায় মাঙ্গলিক আচারে। যে আচার বাঙালির কৃষ্টির পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ,'রবীন্দ্র রচনাবলী' (৪র্থ খণ্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ।। ১৮ আষাঢ় ১৪১৩ (৩ জুলাই ২০০৬), পৃ. ৪৯৬।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (৮ম খণ্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ।। ১৫ ভাদ্র ১৪১৩ (১ সেপ্টেম্বর ২০০৬), পৃ. ৪৭০।

৩। আধিকারী, গৌতম(সম্পা), 'কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা এক', কথারূপ, ১৭/এ-৩, রবীন্দ্রসরণি, নতুনবাজার, কলকাতা ৭০০০৬৫, ষষ্ঠ সংকলন, জুলাই ২০১০,পৃ. ৭৫।

৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৭ ।। মে ২০১০, পৃ. ১৪৪।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫।

৬। https://www.thewall.in/poet-nirendranath-chakraborty-remembered-by-cousin-pronab-kumar-mukhopadhayay collected: Date 17/04/2020, 4.38 p.m

৭। সঞ্জয়কুমার দাসকে প্রেরিত বার্তা ম্যাসেঞ্জার নামক সামাজিক মাধ্যমে । তাং ২৪/১০/২০১৯

৮। সঞ্জয়কুমার দাসকে প্রেরিত বার্তা ম্যাসেঞ্জার নামক সামাজিক মাধ্যমে । তাং ০২/০২/২০২০

৯। KUMAR, DHARMA, 'LAND AND CASTE IN SOUTH INDIA, AGRICULTURE LABOUR IN THE NINETEETH CENTURY', CAMBRIDGE THE UNIVERSITY PRESS, UK, First paperback edition 2013, p. 189

১০। SHYAM CHAURASIA, RADHEY, 'HISTORY OF MODERN INDIA,1707 AD TO 2000 AD', ATLANTIC PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS, B-2, Vishal Enclave, Opp. Royouri Garden, New Delhi-27, 2002, p. 72।

১১। দাস, দিনেশ, 'দিনেশ দাসের কবিতা', পাণ্ডুলিপি, ৪৪ লেক অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯, প্রকাশ ১৩৫৮ শ্রাবণ, পৃ. ৪৬।

১২। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'পদাতিক', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, পৃ. ১১।

১৩। ভট্টাচার্য, সুকান্ত, 'সুকান্ত সমগ্র', সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ :৩১শে শ্রাবণ ১৩৬৪, পৃ. ৮০।

১৪। দাশ, জীবনানন্দ, 'সাতটি তারার তিমির', শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, পৃ. ৫৫।

১৫। ইসলাম, নজরুল, 'সঞ্চিতা', ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, দ্বাবিংশ সংস্করণ, মাঘ, ১৩৭৯, পৃ. ৬৫।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

১৮। ঐ, পৃ. ৯৭।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

২০। বসাক, অনিল, সুনির্মল মৈত্র, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রণেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ভট্টাচার্য, (অনুবাদক), 'তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা', পি সুন্দরাইয়া, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ, ১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৭১।

২১। ঐ, পৃ ২৭২।

২২। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'আমার বাংলা', ঈগল পাবলিশিং কোং লিঃ, ১১-বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা-২০, দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ।

২৩। ঐ, পৃ. ১৩৭।

২৪। ঐ, পৃ. ১৩৮।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৬। ঐ, পৃ. ৭৪।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

২৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, 'ননী ভৌমিকের চৈত্রদিন', 'গল্পসরণি ননী ভৌমিক বিশেষ সংখ্যা', অমর দে (সম্পা), দেবভূতি ভবন, বাজারপাড়া, সিউড়ি, বীরভূম-৭৩১১০১, পঞ্চদশ বার্ষিক সংকলন, দীপাবলী ১৪১৭/২০১০, পৃ. ৪৩২।